

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : শ্রমিক, বালি উত্তোলন কর্মী
শাহাদাতের স্থান : ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

শহীদের জীবনী

২ অক্টোবর ১৯৭৮ সালে বরগুনা জেলার তালতলী থানার ছোট বৌদি গ্রামের জাকির তাবুক পাড়ার পিতা মোহাম্মদ কাঞ্চন আলী ও মাতা রহিমা বেগমের হৃদয়ঙ্গম পরিবারে শহীদ বাবুল মিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ৮ ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন ষষ্ঠ। নিজ এলাকায় নিজেদের ভিটামাটি কিছুই ছিল না তাদের। তার বাবা বেশিদিন বাঁচেননি। তখন ছেলে সন্তান হওয়ায় পরিবারের দায়িত্ব তার ওপর এসে পড়ে। তিনি একা হাতে ছোট দুই ভাই বোনকে মানুষ করেছেন। বোনের ভালো বিয়ে দিয়েছিলেন। তার নিজেরো ২টি সন্তান আছে। তিনি জীবিকার জন্য বাবুলর ড্রেসারের কাজ করতেন। তিনি ছিলেন দিনমজুর, পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।

এমন একজন শহীদের কথা যখন ভাবি, তখন চোখের সামনে এক দৃশ্য ভেসে ওঠে, যা কখনো ভুলে যাওয়ার মতো নয়। ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের এক শহীদ, যার নাম হয়তো আমাদের অনেকেই জানা হয়নি, কিন্তু তাঁর জীবন আমাদের হৃদয়ে চিরকাল বিরাজ করবে। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ যিনি গরিব ঘরের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য হিসেবে নিজের পরিবারের বোঝা কাঁধে নিয়ে প্রতিটি দিন কাটাতেন। তাঁর পা ছিল ভাঙা—যেটি হয়তো তাঁর জীবনের এক বড় যন্ত্রণা, কিন্তু তিনি সেই যন্ত্রণা নিয়েই কাজ করতেন, সংসারের হাল ধরতেন। তার স্ত্রী সন্তানেরা দিনশেষে তাঁর কাছে অপেক্ষা করত। তাঁর বুকের মধ্যে এক অদম্য শক্তি ছিল—সেই শক্তি ছিল না শুধু নিজের জন্য, ছিল তাঁর পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য। সে দিনগুলো ছিল একটানা সংগ্রামের। প্রতিদিনের কঠিন জীবন সংগ্রাম তাকে মানিয়ে নিতে শিখিয়েছিল। যখন তার শরীরে শক্তি কমতে শুরু করেছিল, তখনও সে থেমে যায়নি। ভাঙা পায়ের যন্ত্রণাকে সে উপেক্ষা করেছিল, যেন তার পরিবারের মুখে খাবার তুলে দেওয়ার জন্য তার দেহ আর মনের মধ্যে কোনো বাধা না থাকে। তার স্বপ্ন ছিল, একদিন সে তার পরিবারকে এই শোকের, এই দারিদ্র্যের অন্ধকার থেকে বের করে আনবে, একদিন তার মায়ের মুখে হাসি ফোটাবে। কিন্তু সে জানত না, তার জীবনের গল্প এখানেই থেমে যাবে। এই বাবুল মিয়া ছিলেন একজন পরহেজগার ব্যক্তি। তার প্রতিটি কাজের মধ্যে এক ধরনের পবিত্রতা ছিল। তিনি কখনোই অন্যের প্রতি অবিচার করতেন না, কখনো নিজের সুখের জন্য অন্যের ক্ষতি করতে চাননি। তার প্রতিটি সিদ্ধান্ত ছিল সৎ, সত্য ছিল তার জীবনের মূলমন্ত্র। এমনকি যখন তার পরিবার আর্থিক কষ্টে দিন কাটাচ্ছিল, তখনো তিনি নিজের আয়ের একটি অংশ নিয়মিতভাবে সমাজসেবা ও দান-ধর্মের কাজে ব্যবহার করতেন। ধর্মীয় অনুভূতি এবং মূল্যবোধে গড়া এই পরহেজগার জীবন তাকে শুধু তার পরিবারেই নয়, সমগ্র সমাজে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে সাহায্য করেছিল। তার ধর্মীয় আনুগত্য, সত্যতা এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ গুণ।

যেদিন তিনি আন্দোলনে যোগ দিতে রাস্তায় বের হন তার চোখে ছিল এক আলোকিত আগ্রহ, এক স্বপ্ন—যে স্বপ্ন ছিল মানুষের অধিকার আদায়ের, দেশের পরিবর্তনের। তিনি জানতেন না, তার সেই পথচলা শেষ হয়ে যাবে। তিনি জানতেন না, তার বুকের মধ্যে যে অদম্য সাহস ছিল, তা শেষ মুহূর্তে গুলি হয়ে পড়বে তার শরীরে। তিনি জানতেন না, তার ক্ষতবিক্ষত শরীর, ভাঙা পা, বুকভরা স্বপ্ন কোনোদিন ফিরে আসবে না। তার চোখে ছিল মর্যাদার চোখ, ছিল নিজের দেশ ও জাতির প্রতি ভালোবাসা। কিন্তু তিনি জানতেন না, তিনি যেই মুহূর্তে শহীদ হবেন, সেই মুহূর্তে তার পরিবার, তার সন্তানেরা এক অদৃশ্য শূন্যতায় হারিয়ে যাবে। তার মা কখনোই জানবে না, সে কেন আর ফিরে আসবে না। অথচ, তিনি যে স্বপ্ন দেখে গিয়েছিল, সেই স্বপ্ন ছিল সবার জন্য সমতা, অধিকার এবং ভালোবাসা। কিন্তু একদিন, তার এই স্বপ্নের পরিণতি হয়ে উঠল চিরতরে নিঃশেষিত এক জীবন। যখন তার রক্ত মাটিতে পড়ে, তখনও তার বুকের ভিতর কেবল একটি সুর ছিল—“আমার দেশ, আমার মানুষ, আমার প্রিয়জনদের জন্য।” যতটা দরিদ্র ছিলেন তিনি ততটাই ছিল তার স্বপ্নের পরিধি বড়। সেই শহীদ আজ আমাদের চোখের সামনে এক অদৃশ্য বার্তা রেখে গেছে—যে কোনো সংগ্রাম, যে কোনো আন্দোলন, যদি সত্যের জন্য হয়, তাহলে তার মর্মবেদনা, তার আত্মত্যাগ কখনো বৃথা যায় না। তাঁর বুকফাটা চিৎকার, তাঁর নিরব কান্না আজও প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে বাজছে, তিনি আজ আমাদের শিখিয়ে গেছেন, আসল সাহস কী, আসল ভালোবাসা কী।

অর্থনৈতিক অবস্থা

২রা অক্টোবর ১৯৭৮ সালে বরগুনা জেলার তালতলী থানার ছোট বৌদি গ্রামের জাকির তাবুক পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন শহীদ বাবুল মিয়া। তার বাবা মোহাম্মদ কাঞ্চন আলী ও মা রহিমা বেগম ছিলেন এক হৃদয়ঙ্গম পরিবারের বসবাসরত, যেখানে জীবনযাত্রার একমাত্র আশা ছিল কঠোর পরিশ্রম। বাবুল মিয়া ছিলেন ৮ ভাই-বোনের মধ্যে ষষ্ঠ, যার কাঁধে পড়েছিল জীবনের অশেষ ভার—তার পরিবারের ভাগ্য বদলানোর চ্যালেঞ্জ। নিজ এলাকাতে কোনো সচ্ছলতা ছিল না। ভিটামাটি বলতে কিছুই ছিল না তাদের। বাবুলের বাবা বেশিদিন বাঁচেননি। একাকী, নির্ধারিত পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়ে বাবুল মিয়ার কাঁধে। জীবনের এক গভীর সংকটের মধ্যে সে সিদ্ধান্ত নেয়, তার পরিবারকে একদিন স্বাবলম্বী করবে। বাবুল মিয়া, নিজেকে কিছু মনে না করেই, ছোটো ভাই-বোনের প্রতি অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে শুরু করেন। বাবার হারানোর শোকেও সে স্থির থাকে, তেমনি, ছোট দুই ভাই-বোনের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে থাকে প্রতিদিন। বড় ভাই বোনেরা ততদিনে নিজেদের সংসার নিয়ে ব্যস্ত।

জীবন সংগ্রাম ছিল ভয়াবহ, কিন্তু বাবুল মিয়া কোনোদিন পিছপা হয়নি। তার জীবিকার একমাত্র মাধ্যম ছিল বাবুলর ড্রেসার কাজ। এই কাজ থেকে যা আয় হতো, তাতে তার পরিবারকে চালানোই কঠিন হয়ে পড়তো, কিন্তু বাবুল তার বেঁচে থাকার জন্য কঠোর পরিশ্রম চালিয়ে যায়। তার প্রতিদিনের জীবন ছিল এক কঠিন

সংগ্রাম-একদিকে নিজের জীবন, আরেকদিকে তার পরিবারের দিকে তাকিয়ে, যেখানে ছোট ভাই-বোনেরা, বোনটির জন্য ভালো বিয়ে, নিজের তিনটি সন্তান-সব কিছুর দায়িত্ব তার কাঁধে ছিল। তার নিজের জীবনকে কখনোই তুচ্ছ মনে করেনি সে, কিন্তু অন্যদের জন্য একটুও কষ্ট বয়ে নিতে দিতো না। বাবুলের সংগ্রামের দিনগুলো ছিল চিরকালীন কষ্টের-একদিকে খালি পকেট, অন্যদিকে অসীম দায়িত্বের বোঝা। অথচ, সে প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতো হাসিমুখে, তার পরিবারকে সম্মান ও ভালোবাসার সঙ্গে রক্ষা করার জন্য। তার নিজের সুখের পরিবর্তে, তার পরিবারকেই সে নিজের সুখ মনে করতো। যদিও কোনো দিন সুখের স্বাদ সে পায়নি, কিন্তু তার ছোট ভাই-বোনের হাসি, তার সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল তার জীবনের একমাত্র অনুপ্রেরণা। তার মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে এখন গার্মেন্টসে কর্মরত আছে।

ঘটনার বিবরণ

বাংলাদেশ আওয়ামী শাসন আমলে আসলেই এক অত্যন্ত কঠিন বাস্তবতার মধ্যে ছিল, যেখানে জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা, এবং মানবাধিকার সব কিছুই লঙ্ঘিত হচ্ছিল। সরকার শুধু তাদের নিজের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য অপব্যবহার করেছিল রাষ্ট্রযন্ত্রকে, আর জনগণ, যারা সবসময় সরকারের কর্মকাণ্ডের স্বীকার, প্রতিনিয়ত তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। প্রথমত, শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছিল। প্রশ্ন ফাঁস, পরীক্ষার পরিবেশের অধঃপতন, এবং শিক্ষকদের দ্বারা ছাত্রদের উপর শোষণ-এইসব এমন কিছু ঘটেছে যা কখনো কল্পনা করা হয়নি। ২০২৩ সালের এসএসসি পরীক্ষার সময় যেভাবে প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ইন্টারনেটের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছিল, তা প্রমাণ করে যে সরকার শিক্ষাব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। সবচেয়ে হতাশাজনক বিষয় হলো, শিক্ষামন্ত্রী এবং সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা জানতেও চেয়েছেন না। দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদের পরিশ্রমের ফল না পেয়ে, হতাশা নিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অবস্থা তো একেবারে নাজুক। একদিকে সরকারের উদাসীনতা, আরেকদিকে হাসপাতালের দুর্নীতি। ২০২১ সালে করোনাকালীন সময়ে যখন দেশের হাসপাতালগুলোতে ভরপুর রোগী, তখনও সরকার হাসপাতালগুলোর আসল প্রয়োজনের জায়গায় দাঁড়িয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। “রোগী না পেলেও টাকা চাই”-এ ধরনের অভিযোগ অহরহ শোনা গেছে। রাজধানী ঢাকা শহরের হাসপাতালে এক এক কেবিনের ভাড়া লাখ লাখ টাকা, অথচ চিকিৎসা সেবা নেই, বেডের জন্য রোগীদের হাহাকার। এদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররাজনীতি আজ একটি ভয়ংকর আকার ধারণ করেছিল। ছাত্রলীগ এবং যুবলীগের নেতারা নিজেদের দখলে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করত। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে ছাত্রদের সাথে যে ধরনের আক্রমণ করা হয়েছে, তা ভয়াবহ। সে সময়, একজন ছাত্রকে প্রকাশ্যে পেটানো হয় শুধুমাত্র তার রাজনৈতিক মতামতের জন্য। আবার, ছাত্রদের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটের সামনে হামলা চালানো হয়।

এভাবে দেশের প্রতিটি সেক্টরেই অরাজকতা, দুর্নীতি, এবং অবিচার চলছে। প্রশাসনের শোষণ প্রতিদিনই বেড়েই চলেছিল। পুলিশ, যারা জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা তখন সরকারের গোলাম হয়ে গিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে অপরাধে সহযোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মজার বিষয় হলো, সরকারের শীর্ষ পদে যারা আছেন, তারা এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেন না। দেশে পুলিশের নির্যাতন এবং বিচারবহির্ভূত হত্যার ঘটনা যেন এখন এক নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নরসিংদীতে ২০২৩ সালে এক নিরীহ ব্যক্তিকে পুলিশ ধরে নিয়ে গিয়ে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করেছে, আর তার পর সরকার সেটি ঢাকতে একে একে গণমাধ্যম ও জনগণের চোখে ধুলো দেয়। সবচেয়ে বড় ঘটনাটি ঘটে ২০২৩ সালে কুষ্টিয়ায়, যেখানে পুলিশ একজন নিরীহ সাংবাদিককে অপহরণ করে। এই সাংবাদিকটি কোনো কিছু লেখার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারণা চালান, যা সরকার পছন্দ করেনি। তার বিরুদ্ধে মামলা করা হয় এবং অমানবিকভাবে নির্যাতন করা হয়। এই ঘটনা সরকারের শাসনব্যবস্থার রক্তমাংস বের করে দেখিয়ে দেয়, যে তারা শুধু ক্ষমতাবাদী নয়, বরং জনগণের কণ্ঠকে শ্বাসরোধ করতে প্রস্তুত।

এভাবে আমাদের দেশের জনগণ এক এক করে তাদের মৌলিক অধিকার হারাচ্ছে। সরকার প্রতিটি মুহূর্তে জনগণের প্রতি তার দমন-পীড়ন এবং শোষণের শক্তি ব্যবহার করে যাচ্ছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে বেছে বেছে হয় গুম করে, না হয় তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য করা হত। অনেক বিরোধী দলের নেতাকে চোখের সামনে মিথ্যা মামলা দিয়ে সাজা দেওয়া হয়েছিল এবং সরকার তাদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ মিথ্যাচার করেছিল। বিরোধীদলীয় নেত্রীকে প্রকাশ্যে গালিগালাজ করা, পুলিশ বাহিনীর দ্বারা বিরোধী দলের কর্মীদের গুলি করে হত্যা, এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া-এগুলো যেন হয়ে উঠেছিল প্রতিদিনের ঘটনা। সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দেওয়া, তথ্য প্রকাশের জন্যে শাস্তি প্রদান করা-এটি সরকারের প্রতিদিনের রুটিন।

আমাদের দেশে আইন আর ন্যায়বিচারের কোনো মূল্য নেই; সরকারের শোষণ আর দমনপীড়নই একমাত্র রাজনীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

২০১৮ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে শুরু হওয়া কোটা আন্দোলন ছিল দেশের ছাত্র সমাজের একটি ঐতিহাসিক সংগ্রাম। মূলত সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নামে। তখন বাংলাদেশের সরকারি চাকরির ৫৬ শতাংশ পদ ছিল কোটা ভিত্তিক। এর মধ্যে ৩০ শতাংশ পদ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান ও নাতি-নাতনিদের জন্য, ১০ শতাংশ নারীদের জন্য, ১০ শতাংশ পিছিয়ে পড়া জেলা জনগণের জন্য, ৫ শতাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য এবং ১ শতাংশ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত ছিল। শিক্ষার্থীরা দাবি জানায়, কোটা সংস্কার করে শুধুমাত্র মেধাভিত্তিক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সরকারি চাকরিতে সকলের জন্য অভিন্ন বয়সসীমা নির্ধারণ করতে হবে।

২১ মার্চ ২০১৮ তারিখে, শেখ হাসিনা সরকার কোটা ব্যবস্থা বহাল রাখার ঘোষণা দেয়, যা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এর পরপরই এপ্রিল ২০১৮ মাসে সারাদেশে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। হাজার হাজার শিক্ষার্থী আন্দোলনে যোগ দেয়, তারা ক্লাস বর্জন করে, মিছিল বের করে এবং মহাসড়ক অবরোধ করতে শুরু করে। আন্দোলনকারীরা তাদের দাবির প্রতি সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায় এবং সমাজের প্রতি ন্যায্যতার দাবি তোলে। এ আন্দোলনকে দমন করতে সরকার পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পাঠায়, যার ফলে এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজধানী ঢাকার শাহবাগ মোড়ে পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ ঘটে। এতে অন্তত ৭৫ জন আহত হন। ছাত্রদের উপর পুলিশি দমনপীড়ন এক চরম রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। শাহবাগ মোড়সহ অন্যান্য এলাকাগুলো রণক্ষেত্রে পরিণত হয়, যেখানে শিক্ষার্থীরা শাস্তির বদলে ন্যায্যতা দাবি করছিল। এই অবস্থার মধ্যেই ১১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে ততকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কোটা ব্যবস্থার বিষয়ে এক চমকপ্রদ ঘোষণা দেন। তিনি জানান, কোটা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বাতিল করা হচ্ছে এবং চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাভিত্তিক নিয়োগ পদ্ধতির দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তার এই ঘোষণা কোটা আন্দোলনকারীদের জন্য একটি বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এই আন্দোলন দেশের ইতিহাসে শিক্ষার্থীদের সংগ্রামের এক অগ্নিপরীক্ষা হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু ২০২৪ সালের ৫ জুন থেকে বাংলাদেশে কোটা সংস্কারের দাবিতে নতুন করে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনটি মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের পক্ষ থেকে হাইকোর্টের রায় সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে। হাইকোর্ট সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন করপোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে (নবম থেকে ১৩তম গ্রেড) মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরিপ্রেক্ষিতে একটি রায় দেয়, যা সরকারিভাবে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তারা কোটা সংস্কারের দাবি নিয়ে রাস্তায়

নামেন। এই রায়ে বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ শুরু করে। ঢাকায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে একটি প্রতিবাদী সমাবেশ আয়োজন করে। এরপর তারা শহীদ মিনারে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশও করে, যেখানে তাদের প্রধান দাবি ছিল, কোটা ব্যবস্থার সংস্কার এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের ব্যাপারে পুনর্বিবেচনা। এ আন্দোলনটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ এতে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা আবাবো তাদের ন্যায্য অধিকার এবং সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সোচ্চার হয়। তারা এই আন্দোলনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দাবি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চায় এবং মুক্তিযোদ্ধা কোটা বাতিলের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। ২০২৪ সালের জুলাই মাসের আন্দোলন ছিল এক রক্তাক্ত এবং বেদনাময় অধ্যায়, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সে সময়ে আন্দোলনকারীদের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল এক অভূতপূর্ব যন্ত্রণা এবং সংগ্রামের চিত্র। এই আন্দোলনের এক-একটি দিন যেন বেদনাক্লান্ত স্মৃতি, যা দেশের প্রতিটি পরিবার, প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে গভীরভাবে চিহ্নিত হয়ে রয়ে গেছে।

২ জুলাই ২০২৪

এই আন্দোলন শুরু হয়েছিল এক সাধারণ আহ্বানের মধ্য দিয়ে। শিক্ষার্থীরা সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের জন্য নিজেদের দাবি নিয়ে রাস্তায় নামতে শুরু করে। প্রতিবাদ মিছিল এবং শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের মধ্যে প্রথমে কোনো বড় অশান্তি হয়নি, তবে সরকারের কর্তৃপক্ষ এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নিতে শুরু করে।

৫ জুলাই ২০২৪

এদিন আন্দোলনকারীদের ওপর প্রথম পুলিশি হামলা হয়, এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাস্তায় ছাত্রদের চিৎকার, শোরগোল এবং প্রতিবাদের মধ্যে পুলিশ বাহিনী গুলি চালাতে শুরু করে। কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই শতাধিক ছাত্র আহত হয়ে যায়। গুলি এবং লাঠিচার্জে রক্তে ভেসে যায় সড়কগুলো, শহরের প্রতিটি কোণায় ছিল শোকের ছায়া।

১০ জুলাই ২০২৪

আন্দোলন আরো তীব্র হয়ে ওঠে। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষত শাহবাগ, বেইলি রোড, মতিঝিল এলাকায় বিক্ষোভকারীদের ওপর পুলিশ বাহিনীর হামলা বাড়িয়ে দেয়া হয়। তাদের ওপর আরও সহিংসতা চালানো হয়—লাঠিচার্জ, গুলি, এমনকি গাড়ি ভাঙচুর পর্যন্ত হয়। শিক্ষার্থীরা, যাদের অধিকাংশই যুবক এবং তরুণ, নিজেদের জীবন বিপন্ন করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজেদের অধিকারের পক্ষে আওয়াজ তুলতে থাকে। মায়ের বুকে ফেটে ওঠা কান্না, বাবার শূন্য চোখ, ভাইয়ের শোক—এগুলো ছিল আন্দোলনের প্রতিটি রক্তাক্ত মুহূর্তের চিত্র।

১৬ জুলাই ২০২৪

এদিনে আন্দোলনের চরম তীব্রতা দেখা যায়। রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারায়। তার মৃত্যু, শুধু রংপুর বা ঢাকা নয়, পুরো দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদের জন্ম দেয়। সংবাদমাধ্যমে আবু সাঈদের নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে, একে একে দেশের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীরা আরো বেশী করে রাস্তায় নেমে আসে। ছাত্ররা মিছিল, সমাবেশ, প্রতিবাদ অনুষ্ঠান শুরু করে এবং তাদের দাবি 'কোটা সংস্কার' বাস্তবায়ন করতে সরকারের প্রতি চাপ তৈরি করে।

২০ জুলাই ২০২৪

ঢাকার অভ্যন্তরে সংঘর্ষ তীব্রতর হয়ে ওঠে। পুরো ঢাকা শহর জুড়ে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজেদের দাবির পক্ষে বিক্ষোভ করতে থাকে। সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অসন্তোষ ভেসে উঠতে থাকে। পুলিশ বাহিনী ছাত্রদের ওপর আবাবো অত্যাধিক বল প্রয়োগ করে—লাঠিচার্জ, গুলি, কাঁদানে গ্যাস। রাস্তায় পড়েছিল রক্তের স্রোত, মানুষ ছিল বিক্ষুব্ধ, শোকাহত, ক্ষুব্ধ। এদিন শহরগুলো যেন এক অদৃশ্য শূন্যতায় ঢেকে যেত, যেখানে শুধু ছিল মৃত্যু, কান্না এবং অসহায়ত্বের নিঃশব্দ আওয়াজ। ১৮ জুলাই শহীদ বাবুল মিয়া বাসা থেকে সাভারের উদ্দেশ্যে বের হন। কিন্তু সেখানে আন্দোলন চলাকালীন পুলিশের গুলিতে আহত হন। তখন আন্দোলনকারীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তার কিছুদিন আগেই বালির ড্রেসারে কাজের সময় তিনি পায়ে আঘাত পান ও পঙ্ক হয়ে যান। তাই গুলি লাগার পরে তার শারিরীক অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়। তাই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১ মাস ৩ দিন পরে ২৩ আগস্ট তিনি মারা যান। কিন্তু তার মৃত্যু যেন তার সংগ্রামের শেষ নয়। বরং, তার জীবন, তার পরহেজগার মনোভাব, তার সৎ ও পবিত্র জীবনযাত্রা আজও আমাদের জন্য একটি শিক্ষা হয়ে থাকবে। বাবুল মিয়া শুধু একজন পরহেজগার মানুষ ছিলেন না, তিনি ছিলেন সেই মানুষ, যিনি একে অপরের জন্য সবকিছু দিয়েছিলেন, যার জীবন ছিল সমাজের সেবায় নিবেদিত। তাকে তালতলি গ্রামের গোরস্থানে কবরস্থ করা হয়।

শহীদের সম্পর্কে নিকট আত্মীয়দের অনুভূতি:

শহীদের স্ত্রী: “আমার তো আর কেউ রইলোনা বাবা। তিনি ছিলেন বটবৃক্ষের মত। তার কোন বাজে স্বভাব আছিলো না। পরিবার অস্ত্র প্রাণ ছিলেন। মানুষের একটা উপকার করেছে ছাড়া কোনোদিন ক্ষতি করেন নাই।”

শহীদের বড় ছেলে: “আমার আক্বা যতদিন ছিলেন সংসারের কঠিন কষ্ট ওত বুঝিনি। আমাকে সারাজীবন আদর্শের শিক্ষা দিয়েছেন। আজ আক্বা নেই, দুনিয়া আমার ওপর কঠিনভাবে চেপে বসেছে মনে হয়।”

শহীদের মেয়ে: “আমার আক্বা যে নাই। আমার আক্বাকে তো কেউ আর এনে দিতে পারবে না। আমারে আর কেউ মা কয়ে ডাকবে না।”

শহীদের ছোট বোন: “আমার ভাই সহজ সরল ধার্মিক মানুষ ছিলেন। কারো সাথে প্যাঁচে যেতেন না। দয়ালু মানুষ ছিলেন।”

প্রতিবেশী: “উনি মানুষ ভালো ছিলেন গরীব মানুষ ছিলেন কিন্তু তার সাথে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে একটা কাজ করা যেত।”

একনজরে শহীদ সম্পর্কিত তথ্যাবলি

নাম : বাবুল মিয়া

জন্ম : ০২/১০/১৯৭৮

পেশা : বালির উত্তোলন কর্মী

মাসিক আয় : ১৫,০০০ টাকা

স্থায়ী ঠিকানা : জেলা: বরগুনা, থানা: তালতলী, ইউনিয়ন: ছোট বগি, গ্রাম: জাকির তাবুক

বর্তমান ঠিকানা : জেলা: বরগুনা, থানা: তালতলী, ইউনিয়ন: ছোট বগি, গ্রাম: জাকির তাবুক

পিতার নাম : মো: কাঞ্চন আলী

পেশা : মৃত

মাতার নাম : রহিমা বেগম

পেশা : মৃত

পরিবারের সদস্য সংখ্যা : ৩ জন (স্ত্রী: রাজিয়া বেগম (৩৪)/ গৃহিণী, ছেলে: মো: হাসান/গার্মেন্টস কর্মী (১৯)

মেয়ে: মোছা: তামান্না (১৪)/অষ্টম শ্রেণী)

আক্রমণের স্থান : সাতার

আক্রমণকারী : পুলিশ

আহত হওয়ার দিন ও তারিখ : ১৮ জুলাই

নিহত হওয়ার দিন ও তারিখ : ২৩ আগস্ট, ঢাকা মেডিকেল কলেজ

কবরস্থান : তালতলি